ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৪৯/No. 49
অগ্রহায়ণ ১৪১৬/December 2008

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গ: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

(Qualitative Development in Education and Reform in Madrassa Education: Bangladesh Context)

এ. এস. এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*
সামসুল আলম খন্দকার**

Abstract: *Our educational system has been sliced into multi-dimensional components. The mainstream of learning is affected with ailments leading to make education more or less 'merchandised'. The upper strata inclined to learning Bangla, our mother tongue, in English; the mid-level is passing through a confused state of education. While the lower strata, with a defective and unproductive structure of education, is bent upon building castles in the air. In fact, the upper as well as the mid-levels are looking down with pity and disappointment while the lower strata in turn, pays back in anguish and anger. Its consequences would have been disastrous in future which we have had been experiencing till to date.*

We have witnessed the brutality inflicted upon some of our judges and destruction of legal infrastructures– perpetrated by those people who defied the established norms and values of our judicial system. It is needless to say that the inherent weaknesses of our madrassa syllabi is one of the linking discords of the above mentioned maladies. Against this backdrop, it is high time to address the anomalies of our educational system in compliance with our constitutional provision of a uniform and universal system of education towards a harmonious and sustainable journey for nation building. This article is but an attempt to explore the evolution of Madrassa educational system in this sub-continent. Is this educational system befitting for encountering the dynamics of ever-changing modern life? In fact, this article is a comparative analysis between the madrassa education curricula and the general academic one thrusting upon ideal components of a standard educational system.

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে আমাদের সংবিধানে পরিষ্কার দিকনির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আমরা একটি একরৈখিক (একই পদ্ধিতির) শিক্ষাব্যবস্থা

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় anwarullah1234@yahoo.com
* অফিস সুপারভাইজার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা; sakhandaker@yahoo.com

প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ -এর সংবিধানের ১৭(ক)'এ উল্লেখ রয়েছে- রাষ্ট্র "একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য ....." কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

> *Article - 17. The State shall adopt effective measures for the purpose of -*
>
> *(a) establishing a uniform, mass-oriented and universal system of education and extending free and compulsory education to all children to such stage as may be determined by law; . . .*

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় চল্লিশ বছর পরও আমরা একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিতর্কই শেষ করতে পারিনি। এর অর্থ হচ্ছে আমরা যে সদিচ্ছা এবং শুভ উদ্যোগ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম পদে পদে সেটি ব্যাহত হয়েছে; ফলে, কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য দূরের কথা, যেন হারিয়ে যাওয়া পথ খুঁজছি, অন্ধকারে। কেউ আমরা, এমনকি মাতৃভাষা পর্যন্ত, চর্চা করছি বিদেশি ভাষায়; কারো কাছে শিক্ষা শুধু জীবিকা অর্জনের নিরেট হাতিয়ার; কেউ-বা আমরা ক্ষতযুক্ত শিক্ষা নিয়ে শূন্যে দুর্গ গড়ার স্বপ্নে বিভোর। এই ধরনের বৈপরীত্যপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত বিভিন্ন জনসম্প্রদায় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে করুণা এবং ঘৃণায়। আর এই প্রক্রিয়া, পরোক্ষভাবে, আমাদের সাংবিধানে নাগরিকের জন্যে সমসুযোগ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি—"সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।"*—অর্জনের পথে সবচে বড়ো বাধা হিসেবে কাজ করছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও আমরা উন্নতির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছুতে পারিনি। জনগণের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতির অভাব, দুর্বৃত্তায়ন, সমাজ জীবনের সকল স্তরে অস্বচ্ছতা এবং অসম প্রতিযোগিতা আমাদের পিছিয়ে থাকার কারণ হিসাবে কাজ করেছে। এতোসব গুরুতর সমস্যা যেখানে আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গী সেখানে শিক্ষানীতি প্রণয়নের শর্ত হিসেবে 'নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন' এবং 'জাতীয় সংহতি স্থাপন' শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করা উচিত। পাশাপাশি শিক্ষাকে ব্যবহার করা উচিত সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে। শিক্ষা শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানমুখী হলে হবে না। জনগণের সুযোগের পথ মুক্ত করা, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি এবং জাতীয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে সম্পৃক্ত করা

---

* *Article - 19. (1) The State shall endeavour to ensure equality of opportunity to all citizens.*

জরুরি। মাদ্রাসা শিক্ষা কি এ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম? এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে উক্ত প্রবন্ধে তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। প্রথমেই আমরা জানব মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশ প্রসঙ্গে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা গুণগত-শিক্ষার ধরন কি তা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করব মাদ্রাসা শিক্ষা বাস্তবিক অর্থে গুণগত শিক্ষার শর্তাবলী পূরণ করে কি-না। উল্লিখিত সমস্যাটি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাবার জন্য আমরা বিদ্যমান মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার একটি তুলনামূলক পাঠ আলোচনা করার প্রয়াস নেব। পরিশেষে একটি বাস্তবসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য কী ধরনের উদ্যোগ থাকা বাঞ্ছনীয় তা আলোকপাত করব।

২.০ মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশ

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বহুমাত্রিক ধারা বিদ্যমান। সকল শিক্ষাধারাকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায়: প্রথমত সাধারণ শিক্ষা, এখানে রয়েছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। দ্বিতীয় ধারার শিক্ষার মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় শিক্ষা, বিশেষ করে আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা এ ধারার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা মূলত দ্বিতীয় ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস একটু পেছন থেকে দেখা যাক: ধারণা করা হয় মুসলমানদের ভারত বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইসলামী চিন্তাধারা বিস্তারের নামে ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ম্যাক্সমূলারের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় সেই সময়ে সহস্রাধিক মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ইসলামী ভাবধারা সমৃদ্ধ কোরানিক শিক্ষা প্রসারের কাজে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠেন।[১] তারপর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ইংরেজ কোম্পানী এ দেশের মুসলিম নেতাদের অনুরোধে ১৭৮০ সালে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস এ সুযোগটি হাতছাড়া করেন নি। একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে পশ্চাৎপদ শিক্ষাধারা টিকিয়ে রাখা, অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের কেরাণী শ্রেণীর চাহিদা মেটানোর অপ-উদ্দেশ্যটিও এর মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়। ১৯২৮ সালের দিকে মওলানা সামসুল ওলামা কামালউদ্দীন কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ হবার পর তাঁর নেতৃত্বে আট সদস্য বিশিষ্ট একটি মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয় যার লক্ষ্য ছিল মাদ্রাসার জন্য পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পরীক্ষা পরিচালনা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সনদপত্র প্রদান করা। বৃটিশ ভারতে এই ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে একটি কৃত্রিম রাষ্ট্রের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামীকরণের প্রয়াস শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৯ সালে

---

১ Stone, Jon R. (ed.), The Essential Max Müller: On Language, Mythology, and Religion, New York: Palgrave, 2002.

মৌলানা আক্রাম খানের নেতৃত্বে গঠিত East Bengal Educational System Reconstruction Commitee[২] দুই প্রদেশের (তৎকালীন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান) শিক্ষাধারায় অভিন্নতা ফিরিয়ে আনবার লক্ষ্য হিসাবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তবিত মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় ধর্মীয় এবং সেক্যুলার বিষয়াদির মধ্যে আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে ৩: ৫ (৩০০: ৫০০)। হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার বাধ্যতামূলক বিষয়বস্তুর বিন্যাস (নম্বর সহ) ছিল : বাংলা বা উর্দু = ১০০, ইংরেজি : ২০০, অংক ১০০, ইতিহাস ও ভূগোল = ১০০, আরবি = ২০০, ফিক্বহ, ফারাইয ও আকাইদ ১০০ এবং বিকল্প বিষয়াদি জন্য নম্বর নির্ধারিত ছিল ১০০।[৩] আক্রাম খান কমিটি অর্ধশতক আগে হলেও প্রস্তাবনার দিক থেকে আধুনিক ছিল। এই কমিটি রিপোর্টে স্পষ্ট করা বলা হয় : সনাতন মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা কোনোভাবেই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে এক হতে পারে না। কারণ সনাতন মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এজন্য তিনি সাধারণ শিক্ষার জুনিয়র স্কুলের পাঠ্য বিষয়কে মাদ্রাসা শিক্ষার জুনিয়র দাখিল শিক্ষাক্রমের সঙ্গে একত্রীকরণ করে জুনিয়র দাখিল শিক্ষাক্রমকে অবলুপ্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। জুনিয়র শিক্ষাস্তর সম্পন্ন করেই কেবল কোনো শিক্ষার্থী সনাতন ধারার মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে যেতে পারবে। সনাতন ধারার মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য এই কমিটি ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক লার্নিং' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন যা সনাতন মাদ্রাসা শিক্ষাধারাকে গুণগত মানসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। মৌলানা আক্রাম খানের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের এই প্রগতিশীল ধারাটি শেষ পর্যন্ত আর অনুসরণ করা হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মাদ্রাসা শিক্ষায় অল্প-বিস্তর সংস্কার সাধিত হয়েছে তবে তার আঙ্গিক ও ধরন একান্তই মাদ্রাসাকেন্দ্রিক, আধুনিক শিক্ষাধারা থেকে তা আলাদা ও নিম্নমানের।

২.১ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষার সীমাবদ্ধতা এবং এর সংস্কারের দাবি লক্ষ করা যায় ১৯৭৪ সালে কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্টে[৪]। এ রিপোর্টেও মৌলানা আকরাম খাঁ'র শিক্ষা রিপোর্টের মতোই দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথমত. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। সাধারণ জুনিয়র শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী ইচ্ছামাফিক মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। দ্বিতীয়ত. ইসলামকি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক সেক্যুলার শিক্ষাও বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে। ১৯৯৭ সালে

২ Report of the East Bengal Educational System Reconstruction Committee, 1949, East Bengal Government.

৩ রায়, অজয়, ইসলাম, শহিদুল, তারেক আলী, জিয়াউদ্দিন ও অন্যান্য, ২০০৬, আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই : একটি বিকল্প ভাবনা, ইনস্টিটিউট ফর এনভায়েরনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, পৃ. ৮৪

৪ শিক্ষানীতি, ২০০০, কুদরাত-এ- খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, সম্পাদনাসহ প্রকাশিত, বাকবিশিস।

জাতীয় শিক্ষা কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এই কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো উন্নত ও এর আধুনিকায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ২০০৩ সালে প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' একটি ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করে। এ কমিশন মনে করে দেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপ্রাণ এবং রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম এ দুটি বিষয়ের উপর গুরত্ব আরোপ সাপেক্ষে এ কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর উপর গুরুত্বারোপ করে। অন্যদিকে মাদ্রাসা ধারার আলিম, ফাজিল এবং কামিল পর্যায়কে সাধারণ শিক্ষার সমমান করার প্রস্তাবনাটিও এই কমিশনের সুপারিশ থেকে এসেছে। শিক্ষার আধুনিক ধ্যান-ধারণায় মাদ্রাসা শিক্ষা বাস্তবিক অর্থে কোনো শিক্ষা কি-না তা প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য কমিশনের দ্বার্থহীন এই ঘোষণাটিই যথেষ্ট: "শিক্ষার্থীদেরকে ইহলোক-পারলৌকিক জ্ঞানে দক্ষ ও দ্বীনী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত রেখে রাষ্ট্র ও সমাজের আদর্শ নাগরিক এবং সীরাতে-সরতে প্রকৃত মুমিনরূপে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।"[৫] জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ মাদ্রাসা শিক্ষাকে কতোটুকু সংস্কার করতে সক্ষম হয়েছে তার চেয়ে বড় বিষয় হলো: মাদ্রাসা শিক্ষার আড়ালে আদর্শ নাগরিকদের কীভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তিতে পরিণত করা যায় এ কমিশনে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এক নজরে দেখা যাক বিভিন্ন শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষা		মাদ্রাসা শিক্ষা
কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) শিক্ষার লক্ষ্য : বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করে হবে। পাঠক্রম: জাতীয় ঐতিহ্য সম্বলিত ও সেক্যুলার শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে।		
প্রাক-প্রাথমিক স্তর	এক. কমিশন প্রাক-প্রাথমিক স্তরকে মানব জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। দুই. প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যসূচি ও এক ও অভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রচলন করার প্রস্তাব রয়েছে। তিন. পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত না রেখে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সপ্তাহে মাত্র দুটো পিরিয়ডে ধর্ম বা নীতিশিক্ষার পাঠ দেওয়া যেতে পারে।	সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়ও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা না রাখার জন্য প্রস্তাব করা হয়।
মাধ্যমিক শিক্ষা (নবম-দশম)	ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক হবে না।	ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক হবে না।
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি[৬] (১৯৭৬)	প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষাকে অবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠভুক্ত করা হয়।	গতানুগতিক ধর্মীয় শিক্ষার ধারা অব্যহত রেখে এর সঙ্গে কিছু বিজ্ঞান বিষয়কেও পাঠ্যভুক্ত করা হয়।
অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি (১৯৭৯)		মাদ্রাসা শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান সংস্কার না করেই দাখিলকে মাধ্যমিক, ফাজিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর এর সমমান দেবার প্রথম প্রস্তাব করা হয়।

৫ জাতীয় শি কমিশন রিপোর্ট, ২০০৩, প". ২৭১-২৭৭ এবং দেখুন রায়, অজয় ২০০৬, প". ৮৩।

৬ প্রফেসার সামসুল হককে চেয়ারম্যান করে এ কমিটি গঠিত হয়।

আবদুল মজিদ খান রিপোর্ট (১৯৮৩)	দশম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়।	মাদ্রাসাকে আলাদা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে নিয়ে এ ধারাটিকে আরো শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮	শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলী বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধর্মানুরাগী করতে হবে। এজন্য শিক্ষাধারায় ইসলামী মূল্যবোধকে আরো গুরুত্ব দিতে হবে।	মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো ঢেলে সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অংশ হিসাবে আলিম ও কামিলকে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সমমান দেবার প্রস্তাবনাকে যৌক্তিক করে তুলা হয়।
শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টা (১৯৯১-৯৫)	১. শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, আত্মিক ও সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ আদর্শ মানুষ তৈরি করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।	মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আরো দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭)	এই রিপোর্টে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে নীতিশিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।	কোনোপ্রকার সংস্কারের প্রস্তাব না করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে পূর্ববর্তী অবস্থায়ই বজায় রাখা হয়।
জাতীয় শিক্ষানীতি (২০০০)	জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭) এর প্রস্তাবনা কিছুটা সংস্কার সাপেক্ষে নতুন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।	

ছক ১ : বিভিন্ন শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসঙ্গ[৭]

কমিশনে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব:

উপর্যুক্ত ছক বিশ্লেষণ করলে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন ব্যতীত প্রত্যেকটি শিক্ষাধারায় সাধারণ শিক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষার প্রত্যেকটি ধাপকে ধর্মীয়করণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। ৭৫-পরবর্তী বাস্তবতায় প্রত্যেকটি শিক্ষাধারায়ই বাস্ত বভিত্তিক কিংবা যুগোপযোগী শিক্ষাধারা নির্মাণের কোনো প্রয়াস ছিল না। মাদ্রাসা শিক্ষার এই ধারাটি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কে আলোকপাত করব।

৩.০ শিক্ষার গুণগত মান প্রসঙ্গ ও মাদ্রাসা শিক্ষা

একটি সুষ্ঠু ধারার শিক্ষাকাঠামো প্রণয়নের জন্য তার লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আর আমাদের জাতীয় প্রতিশ্রুতি যদি হয় একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা তাহলে শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। এজন্য আমাদের শিক্ষাকে বৈষয়িক-বৃত্তির পাশাপাশি মানসিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। বৈষয়িক বৃত্তির সঙ্গে মনোবৃত্তির সংযোগই পারে একটি জাতিকে আদর্শ জাতিসত্তায় পরিণত করতে। মনোবৃত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাদি হলো : সামাজিক, নৈতিক এবং মূল্যবোধগত আদর্শ অর্জন। এসব ব্যতীত জাতিগত সংহতি স্থাপন করা সম্ভব নয়। জাতিগত সংহতি না থাকলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্য গুণগত মানের শিক্ষাকে বৈষয়িক এবং মানবিক উভয় দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে হবে। উন্নত গুণগত মানের শিক্ষা পরিচর্যার জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনও অপরিহার্য। এজন্য সুস্থ ধারার শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষানীতির

[৭] ভূঁইয়া, ২০০৫.

যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন জাতীয় অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত। সুতরাং শিক্ষা, সামাজিক সংহতি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

গুণগত মানের শিক্ষার প্রসঙ্গ আলোচনা সাপেক্ষে যে প্রশ্নগুলো সামনে চলে আসে তন্মধ্যে : আমাদের সাধারণ শিক্ষা কী গুণগত মান সম্পন্ন ? শিক্ষাবিদদের মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।[৮] আদর্শ নাগরিক, দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য যে মান ও গুণের শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন তার কোনোটিই এখানে উপস্থিত নেই। এমন বাস্তবতায় মাদ্রাসাশিক্ষা কতটুকু গুণগত মানের তা প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না।

মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো: ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার বিস্তার, ধর্মের মৌলিক সূত্র ও ধারাসমূহ বিশে-ষণ ও ধর্ম সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির সমাধান বের করার কৌশলাদি রপ্ত করা। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বশেষ কামিল পর্যায় পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার যে পাঠক্রম রয়েছে তা পর্যালোচনা করলে এটিই পরিলক্ষিত হয়। আমরা লক্ষ করে দেখব গোটা মাদ্রাসা শিক্ষায় আরবী ভাষার প্রাধান্য খুবই প্রকট। এবতেদায়ী পর্যায় থেকে কামিল পর্যন্ত গোটা সিলেবাসে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের আধিক্য। কোরআন ও সুন্নাহ বিষয়ক জ্ঞান পরিশুদ্ধভাবে অর্জনের মাধ্যমে ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার মতো পাণ্ডিত্য অর্জন করানোই যেন এ ধারার শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

এবার সাধারণ শিক্ষাধারার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এখানে স্পষ্টত তিনটি ধারা লক্ষণীয়: বিজ্ঞান, বাণিজ্যিক শিক্ষা, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষা। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে পরবর্তী ধাপের শিক্ষা কারিকুলামের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য বিভিন্ন বিষয় পাঠদান করানো হয়। যেমন : মাতৃভাষা, বিদেশি ভাষা হিসাবে ইংরেজি, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ ইতিহাস, কলা, সাধারণ বিজ্ঞান ইত্যাদি। বিশেষ করে মাতৃভাষায় শক্ত গাঁথুনির পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার উপরও পদ্ধতিগত পাঠপরিক্রমা গ্রহণ করা এ ধারার শিক্ষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এস.এস.সি থেকে শিক্ষার একমুখীন-বিশেষজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে ছাত্রদের চাহিদা ও পছন্দ মোতাবেক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক শাখায় বিভক্ত করে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। স্নাতক (পাস এবং অনার্স) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ অর্থে বিশেষজ্ঞ-শিক্ষা প্রদান করা হয়। কাঠামোগত দিক থেকেও মাদ্রাসা শিক্ষা পিছিয়ে রয়েছে। নিচের ছকটি মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার কাঠামোগত পর্যালোচনার একটি চিত্র প্রতিবেদন দিতে সক্ষম হবে :

---

৮ ২০০৬ সালে ইনস্টিটিউট ফর এনভায়েরনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট থেকে প্রকাশিত আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই : একটি বিকল্প ভাবনা গবেষণা কর্মে লেখকগণ যৌক্তিক প্রেক্ষাপট থেকে এ দাবি করেছেন। বিস্তারিত দেখুন রায়, অজয়, ইসলাম, শহিদুল, তারেক আলী, জিয়াউদ্দিন ও অন্যান্য, ২০০৬।

মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামোগত ধরন	সাধারণ শিক্ষার কাঠামোগত ধরন
<u>স্তরবিন্যাস</u> মাদ্রাসা শিক্ষায় পাঁচটি স্তরঃ এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল এবং কামিল **মন্তব্যঃ** শিক্ষার পাঁচটি স্তরই একই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।	<u>স্তরবিন্যাস</u> সাধারণ শিক্ষায় পাঁচটি স্তরঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক,উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর **মন্তব্যঃ** প্রত্যেকটি স্তর আলাদা হবার কারণে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব।
শিক্ষক প্রশিক্ষণ মাদ্রাসা শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই; যা আছে তা খুবই অপ্রতুল। ফলে, শিক্ষা মেথড, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রদানের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষকদের ব্যাপক ঘাটতি রয়ে গেছে। যেকারণে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থাপনাগত ও মানগত দিক থেকে দুর্বল হিসাবেই গণ্য করা অসংগত নয়।	**শিক্ষক প্রশিক্ষণ** সাধারণ শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, প্রাথমিক পর্যায়ে পিটিআই ট্রেনিং, মাধ্যমিক পর্যায়ে বি.এড ট্রেনিং এবং উচ্চতর পর্যায়ে এম.ফিল এবং পি.এইচডি ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে শিক্ষা মেথড, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রদানের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকেন।
প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা চেয়ারম্যানঃ জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসকের মনোনিত মাদ্রাসা শিক্ষায় আগ্রহী স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসাবে রাখা হয়। সদস্যঃ ১. পদাধিকার বলে মাদ্রাসা প্রধান, ২. ছাত্র অভিভাবক,৩. প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে একজন, ৪. দাতাদের মধ্য থেকে একজন, ৫. মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত একজন, ৬. পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের পরিচালক কর্তৃক মনোনিত একজন এবং গভর্নিং বডি একজন মেডিক্যাল অফিসারেক কো-অপ্ট করে নিতে পারেন। মন্তব্যঃ ১.লক্ষণীয় বিষয় হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাদ্রাসার চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক স্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তি এবং অধ্যক্ষের উপর ছেড়ে দেন।এই সুযোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ মাদ্রাসার হর্তকর্তা হয়ে বসেন। আবার মাদ্রাসা শিক্ষকদের অধিকাংশই ঐ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার ফলে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃত হয়। ২. একই কমিটি এবতেদায়ী থেকে উচ্চতর ফাজিল কিংবা কামিল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে থাকে। এতে করে অনেকক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের যথাযথ দেখবাল, গুণগত উৎকর্ষ বিধান সম্ভব হয়ে উঠে না।	**প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা** সাধারণ শিক্ষায় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ইতিবাচক দিক হল প্রতিটি স্তরে আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকে। বিভিন্ন স্তরের উচ্চক্রম অনুসারে ব্যবস্থাপনা কমিটির গুণগত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি পরোক্ষভাবে হলেও বিবেচনায় থাকে। ফলে মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনার হ-য-ব-র-ল অবস্থাটি সাধারণ শিক্ষায় লক্ষ করা যায় না।

ছক ২ : মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার কাঠামোগত ধারা

আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় সাধারণ শিক্ষার মান ও গুণগত উৎকর্ষ নিয়ে অনেক সংশয় এবং প্রশ্ন রয়েছে। তারপরও মামুলিমানের হলেও এ শিক্ষা দক্ষ-জনশক্তি সৃষ্টি, মানবিক উৎকর্ষ, জাতীয় মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক বিকাশে ভূমিকার রাখার মতো যোগ্য নাগরিক সম্প্রদায় গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। এ লক্ষ্য ন্যূনতম মাত্রায় অর্জিত হলেও সাধারণ শিক্ষার মধ্য দিয়েই কেবল আমরা এ লক্ষ্য অর্জনের শর্তসমূহ প্রত্যাশা করতে পারছি। যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও এর পাঠক্রম নিয়ে আমরা সংশয় প্রকাশ করছি সেক্ষেত্রে সনাতন ধারার মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্য দিয়ে নাগরিককে কতোটা লক্ষ্যাভিমুখী করা যাবে সেটা কিন্তু ধর্তব্যে আনা খুবই প্রাসঙ্গিক। যেখানে আমাদের দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে সমতুল্য নয় বলে দাবি উঠছে, সেই ক্ষেত্রে তার থেকেও নিম্নমানের শিক্ষাধারার সাহায্যে কি গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা

বাস্তবায়ন সম্ভব? গুণগত মানের শিক্ষা কি? এ ধারার শিক্ষা কি রকম হওয়া উচিত? গুণগত মানের শিক্ষার প্রসঙ্গ আসলে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে : শিশুকে কিভাবে শেখানো হচ্ছে ? কী শেখানো হচ্ছে? এসব প্রশ্ন সামনে রেখে আমাদের প্রথমই বিবেচনায় আনতে হবে যে কোনা শিক্ষাধারায় প্রাথমিক শিক্ষার[৯] স্বরূপটি কি রকম হওয়া উচিত?

World Declaration on Education for All (EFA) ঘোষণাও গুণগতমানের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব করা হয়। এ প্রস্তাবে কয়েকটি পূর্বশর্তের কথাও বলা হয়:

পূর্বশর্ত ১ : শিশুর সামগ্রিক বিকাশ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কোনোভাবেই যেন শিশুকে পাঠদান বা বিদ্যালয়মুখী করা হচ্ছে এরকম প্রবণতা থেকে বিবেচনা করা যাবে না। শিশু যেন পরবর্তী পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী হয়ে উঠে সে লক্ষ্যে তাদেরকে মনো-সামাজিক অবস্থায় নিয়ে আসাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুকে সুনির্দিষ্ট কোনো পাঠদান, বিমূর্ত কোনো বিষয়াদি সম্পর্কে শেখানোর কৌশলও অবলম্বন করা যাবে না। এখানে মুখ্য বিবেচনাই হবে শিশুর সুষম-বিকাশ। শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি গ্রহণ, নিরাপদ এবং বিশুদ্ধ পরিবেশ প্রদান করতে হবে। এসবকিছুর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুর সামগ্রিক বিকাশ। শিশুর মানসিক বিকাশ তার বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে জড়িত। শিশুর এসব বিকাশকে আমরা মোট পাঁচটি দিক থেকে বিবেচনা করতে পারি: দৈহিক বিকাশ (physical development), জ্ঞানগত বিকাশ (cognitive development), ভাষাগত বিকাশ (language development), আবেগগত বিকাশ (emotional development) এবং সামাজিক বিকাশ (social development)।

শিশুর এ বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য যেভাবে তাকে পরিচলন করতে হবে তাও বিবেচনা রাখতে হবে। কারণ শিশুর বিভিন্ন বিকাশের সঙ্গে তার শিখনটিও গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শিশুকে যেভাবে শেখাতে হবে[১০] : ১. উদ্দীপনামূলক বস্তু এবং বস্তুগত ক্রীড়া উপাদানের সাহায্যে খেলাধুলা করা, ২. খেলাধুলায় অনুশীলন এবং তাতে অংশগ্রহণ করা, ৩. কথোপকথন, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও সংলাপে শিশুকে

---

৯ প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক এ দুটি স্তরকে একত্রিত করে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে আলোচনা করতে পারি। পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের জন্য যে শিক্ষা তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন রয়েছে কি-না তা নিয়েও প্রশ্ন থাকতে পারে। তবে শিক্ষা চিন্তার ইতিহাসে অনেক তাত্ত্বিকরাই ২ বছর থেকে শিশুকে শিক্ষা প্রক্রিয়ার ভেতর আনার পরামর্শ দেন। ২ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত শিশু শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়।

১০ Bhuiyan, M Musharraf Hossain, Secretary, Ministry of Primary and Mass Education Operational Framework for Pre-Primary Education, http://www.mopme.gov.bd/MoPME%20PPE%20operational%20framework.pdf, at 9 a.m on 29 April 2009.

উৎসাহিত করা, ৪. অন্যদের কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়া, গল্প শুনানোর মাধ্যমে, ৫. মানুষ এবং ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ, দেখা এবং তাদের কথা শুনা, ৬. সামাজিক জীবনে অন্যদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া, ৭. ছবি অঙ্কন এবং কল্পনা করতে শেখানো, ৮. বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদিকে সংবেদনশীল করে তোলা, ৯. বিভিন্নভাবে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিশুর আবেগের জাগরণ, ১০. উন্মুক্ত ছবি অঙ্কন, ১১. বিভিন্ন সহজ পন্থায় প্রকৃতি সম্পর্কে শিশুকে জানানো এবং বিভিন্ন বর্ণ, গন্ধ, কাঠামো, কাজ, আকার-আকৃতি সম্পর্কে শিশুকে শেখাতে হবে : একটির সঙ্গে অন্যটিকে মেলানো, তুলনা করা, বিভিন্ন বস্তু থেকে অন্য বস্তুকে আলাদা করা। এসবের ভেতর দিয়ে শিশু সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেয়।

পূর্বশর্ত ২: শিশুর জন্য যথার্থ শিক্ষা: শিশু অবস্থায় শিশুর নিজের মতো করে শিক্ষা প্রয়োজন। এই শিক্ষার পূর্বশর্ত হিসাবে শিশুকে তার উপযোগী পরিবেশ, মাতৃস্নেহ এবং পরিচর্যা সরবরাহ করা প্রয়োজন। শিশু-শিক্ষা বলি কিংবা শিশুর শারীরিক বর্ধনের কথা বলি উভয়ের জন্যই এই শর্তসমূহ মেনে চলা উচিত। এ পর্যায়ে শিশুর খেলাধুলা এবং শিখন-আগ্রহকে উৎসাহিত করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি পর্যায়কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। তবে সেখানে যেন শিশু স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, মুক্তভাবে খেলাধুলা করতে পারে সেরকম ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর তাকে যে শিক্ষকগণ শেখাবেন তাঁদেরকে অবশ্যই ধৈর্য ও যত্নশীল হতে হবে। এ পর্যায়ে শিশুকে শেখানোর জন্য জে. এল. ইভানস ও অন্যান্যরা বেশ কয়েকটি ধাপের কথা বলেন[১১]:

> প্রথম পর্যায় : শিশুকে মায়ের আদর যত্ন দিয়ে, পরিবারের সদস্যদের দ্বারা কিংবা অন্য কোনো পরিচর্যা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এবং ছোট পরিসরের পরিচর্যা কেন্দ্রের সাহায্যে তাদেরকে শেখানো যেতে পারে।
>
> দ্বিতীয় পর্যায় : প্রতিবেশী, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যানিকেতনের মাধ্যমে সে লক্ষ্য বাস্তবায়ন হতে পারে।
>
> তৃতীয় পর্যায় : শিশু যখন ছয় বছর অতিক্রম করে কেবল তখনই তাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আওতায় এনে শেখাতে হবে। এ পর্যায়ে শিশুকে যথেষ্ট যত্ন-পরিচর্যা করতে হবে।

উপর্যুক্ত পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় আমরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলতে বুঝব : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৩-৫ বছর বয়সের শিশুর বিকাশমান অবস্থা তথা শিক্ষা-সহায়ক অবস্থা। শিশুর অধিকার সংরক্ষণ, যত্ন-পরিচর্যা, বেড়ে ওঠা এবং পরবর্তী শিক্ষা

---

[১১] ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কোর ২০ তম অধিবেশনে Asia-Pacific Programme of Education for All (APPEAL) কর্মপন্থায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গ্রহণের জন্য দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির পর্বও এটি। এখানে শিশু শিখবে খেলাচ্ছলে, আনন্দে, শিশুতোষ গল্প পাঠের মাধ্যমে, সংখ্যা গণনার ভেতর দিয়ে। এ পর্যায়ে বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-আর্থ-সামাজিক শ্রেণী নিরপেক্ষভাবে শিশুকে শেখাতে হবে।

পূর্বশর্ত ৩ : ০-৩ পর্যন্ত শিক্ষা পরিকল্পনা : শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করতে হবে। কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর্মস্থলের পাশে মনোরম পরিবেশে, প্রশিক্ষিত সেবিকা-শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত শিশু-নিকেতন গড়ে তুলতে হবে।[১২]

'জন্ম থেকে শিক্ষা' ইউনেস্কোর এই ঘোষণাকে পরিপূর্ণ উপলব্ধির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয়। শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হলো একটি স্বভাবজাত শিক্ষা-অনুপ্রবেশ। এ পর্যায় থেকে শিশু মানসিক, দৈহিকভাবে বিকশিত হতে থাকবে। সুস্থ-সুসংহত এবং শিশু-উপযোগী পরিবেশে শিশুর জন্ম থেকে শিক্ষা কর্মটি সম্পাদিত হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ যেমন, EFA Declaration (1990), Dakar EFA Framework (2000), CRC (1989) CEADAW (1979) MDG (2000) শিশু অধিকার সম্পর্কিত এসব ঘোষণাকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের জাতীয় পর্যায়েও বেশকিছু পলিসি ইতোমধ্যে হয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে : National Children's Policy (1994), PRSP (2004-6), NPA for Children (2004-9) Ges Policy Framework for Pre-Primary Education (2007)। জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত এসব নীতিও পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। কয়েকটি অন্তর্জাতিক সংস্থার

জাতিসংঘ	ইউনেস্কো	ডাকার EFA Framework (২০০০)
সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার থাকতে হবে। ন্যূনতম প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হতে হবে।	সবার জন্য শিক্ষা। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় সবার সমান প্রবেশগম্যতা এবং সবার প্রতি সমান মনোযোগের আহ্বান জানানো হয়। নব্বই দশকের মধ্যে সকল শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সব থেকে দুর্গত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু বিশেষ করে নারী-শিশু, সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীর থেকে আসা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। নির্বিশেষ সকলের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য ভূমিকা রাখতে হবে।

ছক ৩ : বিভিন্ন ঘোষণায় প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

দাবিসমূহ একনজরে দেখা যাক :

তবে এ সময়ে শিশুকে ধরাবাধা নিয়মের অধীনে এনে আতঙ্ক সৃষ্টি করাও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। শিশুর যথার্থ বেড়ে উঠার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

---

[১২] দেখুন Evans, J. L et. al. 2000. Early Childhood Counts: A programming Guide on Early Childhood Care for Development, Washington D.C. The World Bank.

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে মাদ্রাসা শিক্ষা কি উল্লিখিত শর্তাদি পূরণ করে? অথবা আমাদের সাধারণ ধারার শিক্ষা কার্যক্রম কি এসব শর্তাদি পূরণে সহায়ক? মাদ্রাসা শিক্ষা-কারিকুলামের ধরন-প্রকৃতিটি বিশ্লেষণ করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার করা। লক্ষ করা যাক: এবতেদায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে " ইসলামিক ইংরেজি শিক্ষা" নামে ইংরেজি শেখানোর এক অদ্ভূত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এবতেদায়ী ও দাখিল পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞান প্রদানের জন্য ১০০ নম্বরের যে পাঠ্যসূচি রয়েছে তা একান্তই নিম্নমানের।

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যখনই মাদ্রাসা শিক্ষার সমমান দাবি করা হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই মাদ্রাসা শিক্ষা কতোটা পদ্ধতিমাফিক সে প্রসঙ্গটিও চলে আসে। মাদ্রাসাধারার প্রাথমিক শিক্ষার (এবতেদায়ী) কথা ধরা যাক, এবতেদায়ী প্রথম বর্ষে যা শেখানো হয় তার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে কোরআন, আরবি শিক্ষা (ছোটদের কোরআন শিক্ষা) আকাইদ ও ফিকাহ। গোটা পাঠ্যসূচিতে খুব অবহেলিতভাবে রয়েছে বাংলা, গণিত এবং ইসলামিক ইংরেজি শিক্ষার মামুলিমানের প্রয়াস। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষার উপর দখল আনার বিষয়টি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে নুরুল হকের 'মণিমালা' কিংবা সেলিনা সাঈদের 'সহজ পড়া' যে উদ্দেশ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হোক না কেন তা যে ছোটদের মাতৃভাষা শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী নয় এটা যে কেউই গ্রন্থ-দুটির দু'এক পৃষ্ঠা উল্টালেই বুঝতে পারবেন। পাশাপাশি আকাইদ শিক্ষার নামে প্রাথমিক পর্যায় থেকে রয়েছে আরবী, কখনো-বা ফার্সি কিংবা উর্দু ভাষা সংবলিত পুস্তক। যেমন এবতেদায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীতে মোট পাঠ্যসূচির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে আকাইদ, ফিকাহ, কিরাতুল হাদিস এবং উর্দু-ভাষায় লিখিত কায়দা। মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামী জ্ঞান ভাবনায় শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ করে তোলা। মাদ্রাসা শিক্ষার এই ধারাটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এবতেদায়ী দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে 'উর্দু কি পহেলি কিতাব', 'ফার্সি কি পহেলি কিতাব', 'উর্দু কি দুসরি কিতাব' 'জাওয়াবে উর্দু' ইত্যাদি নামে উর্দু ও ফার্সি শেখানোর যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তা প্রকৃত শিক্ষার কোনো শর্তের ইঙ্গিত বহন করে না।

খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় : মাতৃভাষার আওতায় উর্দুকে বাংলার বিকল্প করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা গোটা সিলেবাসে মাতৃভাষা শিরোনামে বাংলার সঙ্গে যদি ইংরেজির বিকল্প না হয় তাহলে উর্দুর সঙ্গে কেন এ বিকল্প? মাদ্রাসা শিক্ষার গোটা সিলেবাস পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ করা যাবে আমাদের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এখানে উপস্থিত নেই, রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহও অনেকক্ষেত্রে এ শিক্ষা-করিকুলামে অনুসৃত হয়নি। সুতরাং এ ধারার শিক্ষা সংস্কার তথা গুণগত মান উন্নয়ন নিয়ে এখনই চিন্তা করা সঙ্গত।

আরো উচ্চতর পর্যায়ে (দাখিল, আলিম এবং ফাজিল) কোরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যা এবং তর্জমার জন্য নির্দিষ্ট উর্দু বই পাঠ্য হিসাবে পাওয়া যায়। কামিল পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর প্রদানের দুটি ভাষা-মাধ্যমের একটি হলো উর্দু। আরবীর বিকল্প হিসাবে উর্দু ভাষায় প্রশ্নোত্তর লেখার অনুমোদন রয়েছে। আরবী ব্যাকরণ, হাদিছ, ফিকাহ ইত্যাদি যদি উর্দু ভাষায় চর্চা করার করা যায়, তাহলে স্বাভাবিক কারণে আমরা ধরে নেব এসব বিষয়াদি মাতৃভাষাও চর্চা করা যায়। কিন্তু এবতেদায়ী থেকে কামিল পর্যন্ত গোটা শিক্ষা ধারায় লক্ষ করা যায় মাতৃভাষার প্রতি একধরনের অনীহা, তাচ্ছিল্য। পুর্ববর্তী আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উত্থাপিত হতে পারে: মাতৃভাষা অপেক্ষা উর্দু এবং ফার্সি ভাষার প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এতো ঔৎসূক্যের কারণটি কী? এটা খুব সহজ করে বলা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের মাতৃভাষার প্রতি এই অনীহার কারণে শিক্ষার্থীদের স্ব-জাত্যবোধ ও সাংস্কৃতিক আবহ থেকে বিচ্যুতি এবং পশ্চাৎপদ শিক্ষাধারার মধ্য দিয়ে একটি অদক্ষ এবং কূপমণ্ডুক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হচ্ছে। মাদ্রাসা ধারার শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যে জাতিগত ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্বেষ, জাতিগত সাংস্কৃতিক ধারাকে বর্জন করার যে চিরাচরিত প্রবণতা লালন করার মানসিকতা রয়েছে জ্জ এই বিষয়গুলো তারই ইঙ্গিত বহন করে। প্রকারান্তরে এটাও সত্য যে, সাংস্কৃতিক বোধ ও ঐতিহ্য পরিপন্থি শিক্ষাধারা জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। আর যৌক্তিকতার এই পর্যায় থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি বর্তমানে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা কোনোভাবেই সাধারণ শিক্ষার সমতূল্য হতে পারে না। কামিল বা ফাজিলকে যথাক্রমে ড্রিগ্রি বা স্নাতকোত্তরের সমমান করার প্রসঙ্গটি উক্ত শিক্ষাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের জন্যেই আত্মঘাতি কারণ বিদ্যমান শিক্ষাকারিকুলামের আওতায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনোপ্রকার বিকাশ কিংবা দক্ষতা অর্জনের সুযোগ নেই। মাদ্রাসা-শিক্ষাধারার উচ্চতর পর্যায়ের সিলেবাস ও কারিকুলাম বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৪.০ মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা : শিক্ষাকারিকুলাম

সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামের দিক থেকেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রণীত কারিকুলাম, বিষয়বস্তু শিক্ষার যুগোপযোগী চাহিদাকে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এ বিতর্ক যে অমূলক নয় তা আমরা নিচের ছক থেকেই স্পষ্ট করতে পারি।

সাধারণ শিক্ষা	মাদ্রাসা শিক্ষা
বিশেষজ্ঞ মতামত শিক্ষার্থীর চাহিদা, বয়স, মনস্তত্ত্ব, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি যাচাই করে পাঠক্রম বা কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়। এই যাচাইয়ের জন্য এন.সি.টি.বি (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) রয়েছে।	**বিশেষজ্ঞ মতামত** শিক্ষার্থীর চাহিদা, বয়স, মনস্তত্ত্ব, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি যাচাই করে পাঠক্রম বা কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয় না। এই যাচাইয়ের জন্য তেমন কোনো বিশেষজ্ঞ বোর্ডও নেই।
পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রণীত কারিকুলামের ভিত্তিতে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণের জন্য বিশেষজ্ঞ লেখকদের নির্বাচন করা হয়।	**পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন** প্রণীত কারিকুলামের ভিত্তিতে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণের জন্য বিশেষজ্ঞ লেখকদের কোনো বিবেচনা নেই। মান ও গুণগত উৎকর্ষ বিচার বিবেচনা না করেই, অখ্যাত সব ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রণীত পুস্তকাদি পাঠ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে এবতেদায়ী পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক লক্ষ করা যাক: ক. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৫/৭ টি বই নির্ধারণ করা হয়। এসব বইয়ের সবকয়টিই পাঠ্যপুস্তক উপযোগী নয় বলে অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। লক্ষণীয় এসব গ্রন্থের লেখকদের অধিকাংশই বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা দ্বারা প্রভাবিত বলেও অভিযোগ রয়েছে। ফলে তাদের দ্বারা লিখিত পুস্তক ধর্ম সম্পর্কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপব্যাখ্যায় ভরপুর থাকে।
সমকালীনতা ও উপযোগীতা শিক্ষাকে কিভাবে মানসম্পন্ন করা যায়, যুগোপযোগী করা যায় এবং সমকালীন দাবিকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিস্তার ঘটানো যায় সেদিকটি সাধারণ-শিক্ষায় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখা হয়। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং এর গুণগত মান নিয়ে দেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী প্রমুখদের নিয়ে সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করানো হয় । এই কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হলো শিক্ষার গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস চালানো।	**সমকালীনতা ও উপযোগীতা** শিক্ষাকে কিভাবে মানসম্পন্ন করা যায়, যুগোপযোগী করা যায় এবং সমকালীন দাবিকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিস্তার ঘটানো যায় সেদিকটিও মাদ্রাসা-শিক্ষার কোনো স্তরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সাধারণ শিক্ষায় প্রত্যেক স্তরেই জাতীয় ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ধারাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা কারিকুলাম এবং সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়।	**জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ** মাদ্রাসা শিক্ষার কোনো স্তরেই জাতীয় ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। এপ্রসঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ডের কয়েকটি সিলেবাসের অংশবিশেষ পর্যবেক্ষণ করা যাক: ফাজিল (আবশ্যিক বিষয়সমূহ) : মাতৃভাষা (বাংলা/ উর্দু)-------- ১০০

ছক ৪ : মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার তুলনামূলক চিত্র

দাখিল থেকে ফাজিল পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান কিংবা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পড়ানো অপেক্ষা ইসলামের ইতিহাস পাঠ করানো একটি অপরিহার্য ব্যাপার। আর ইসলামের ইতিহাসের নামে এখানে যা পাঠ করানো হয় তা নিত্যান্তই ইসলামের একতরফা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা সন্নিবেশিত। যুদ্ধ-বিগ্রহ, মুসলমান রাজা-রাজাধিরাজদের জয় পরাজয়ের বর্ণনা এবং তাদের রাজ্য জয়ের তালিকাসূচি ব্যতীত এই ইতিহাসে অন্যকিছু পাওয়া যায় না। বস্তুত ইতিহাস মানব বির্বতনের যে ধারাবাহিক কাল পরিক্রমা, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিকাশের পর্যায়সমূহকে অধ্যয়ন করা হয় মাদ্রাসা শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ইসলামের ইতিহাসে তার ছিটেফোঁটাও পাওয়া যায় না। নিচের ছকটি লক্ষ করা যাক:

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

*তিনটি পত্র, প্রতি পত্রে ১০০ নম্বর করে মোট তিনশত নম্বর

প্রথম পত্র: ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাস ১২৫৮ খৃঃ পর্যন্ত

- হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সময়কালের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড,
- খোলাফায়ে রাশেদীন : জীবন, কর্ম
- **আব্বাসীয় শাসনকাল**

দ্বিতীয় পত্র: ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ইহিতাস ১৭০৭খৃঃ পর্যন্ত

- আরবদের সিন্ধু জয়, সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান, মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণ
- ভারতের মুসলিম শাসন: ইলতুৎমিশ, নাসির উদ্দীন মাহমুদ, গিয়াসউদ্দীন
- খিলজি বংশ, তুঘলক বংশ, তৈমুরের আক্রমণ, বাহমানী ও বিজয় নগর রাজ্য, বাবর ও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয় পত্র: ইসলামী ধর্মীয় সংস্থা এবং মুসলিম সংস্কৃতি এবং মুসলিম সংস্কৃতির অবদান

- ইসলাম, ধর্মীয় সংস্থা
- আইনের মাযহাব
- রাজনৈতিক সম্প্রদায়, ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়
- সূফিবাদ, বুদ্ধিবাদী ও বিজ্ঞানের যুগ

তৃতীয় পত্রের **বিকল্প** হিসাবে রয়েছে : **বাংলাদেশে মুসলিম শাসন অথবা ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলাম ও আধুনিকতাবাদ**

ছক ৫ : মাদ্রাসা শিক্ষায় ইসলামের ইতিহাসে 'ইতিহাস জ্ঞান'[১৩]

শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বলা যাক: আলিম ও ফাজিল পর্যায়ে যে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়েছে তার পাঠ্যসূচি, এবং বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যা হবার কথা তা না হয়ে 'ইসলামী রসায়ন বিদ্যা', 'ইসলামী পদার্থবিদ্যা' এরকম এক ভাব-তাৎপর্যের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান শেখানো হচ্ছে। বাস্তবিক অর্থে বিজ্ঞানের এই ধারাসমূহকে কি ইসলামীকরণ করে উপস্থাপন করা যায়? এখানে বিজ্ঞান বাস্তবসম্মত বিজ্ঞান থেকে যোজন যোজন দূরে। পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কোনো বিজ্ঞান বই পাঠ্য না থাকার কারণে এখানে পাঠদানের ক্ষেত্রে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার কথাও মাদ্রাসার বিজ্ঞান শিক্ষকদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। নিচের ছকে মাদ্রাসায় পাঠ্য বিজ্ঞান পাঠক্রমটি দেখা যাক:

মাদ্রাসা শিক্ষা : আলিম	সাধারণ শিক্ষা : একাদশ শ্রেণী
এক. কুরআন মাজীদ, খ. হাদীস ও উসূলুল হাদীস, গ. ফিকহ্ ও উসূলুল ফিকহ্, ঘ. আরবি দুই. ক. বাংলা, ইংরেজি খ. পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র ও ২য় পত্র (৭৫+২৫) ২= ২০০ গ. রসায়ন বিজ্ঞান ১ম পত্র ও ২য় পত্র (৭৫+২৫) ২= ২০০ ঐচ্ছিক বিষয়: জীববিজ্ঞান (১ম ও ২য় পত্র), উচ্চতর গণিত (১ম ও ২য় পত্র), এবং আরবি ২য় পত্র , ফিকহ্ ২য় পত্র	এক. ক. বাংলা (১ম ও ২য় পত্র), খ. ইংরেজি (১ম ও ২য় পত্র), দুই. পদার্থবিজ্ঞান (১ম ও ২য় পত্র),খ. রসায়ন বিজ্ঞান (১ম ও ২য় পত্র) তিন. গণিত (১ম ও ২য় পত্র), অথবা প্রাণীবিদ্যা(১ম ও ২য় পত্র),

ছক ৬: বিজ্ঞান শিক্ষা (আলিম ও সাধারণ শিক্ষায় একাদশ শ্রেণী)

[১৩] ছকটির জন্য দেখুন : ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ, "সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার সমমানতা প্রসঙ্গ", শিক্ষাবার্তা, (শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা), সংখ্যা?

আলিম পর্যায়ের বিজ্ঞানের যে পাঠ্যসূচি তা আমাদের সাধারণ শিক্ষায় নবম ও দশম শ্রেণীতে পাঠদান করা হয়। আবার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের প্রভাব থাকার কারণে তাদের ভাবাদর্শের নিম্ন-মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এই নিম্নমানের শিক্ষকের হাত ধরে বাস্তবিক অর্থে সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার নামে এক প্রহসন চলছে। সুতরাং এরকম বিজ্ঞানের নামে তথাকথিত শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষার্থী বিজ্ঞান উন্নয়নে কতোট ভূমিকা রাখতে পারবে সে-ই প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে।

লক্ষণীয় যে, ফাজিল পর্যায়ে কোনো বিজ্ঞান শাখা নেই। একাদশ (আলিম) পর্যায় পর্যন্ত মামুলিমানের শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের সাধারণ শিক্ষায় শিফটিং করার প্রবণতাটিও লক্ষ করার মতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় মাদ্রাসা বোর্ড থেকে আগত ছাত্রদের প্রাপ্ত নম্বর সাধারণ শিক্ষা বোর্ড থেকে ছাত্রদের থেকে অনেক অনেক বেশি। তার কারণ হিসাবে দুটি বিষয় পাওয়া যায়: ১. মাদ্রাসা পরীক্ষকদের উত্তর-পত্রের গুণগত মান অপেক্ষা বেশি নম্বর দেবার প্রবণতা, দুই. মাদ্রাসা পরীক্ষা ব্যবস্থায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন করার সুযোগ।

৫.০ সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা : শিক্ষাপদ্ধতি প্রসঙ্গ

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে শিক্ষাপাঠক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট কতোগুলো লক্ষ্য রয়েছে। গতিশীল সামাজিক শর্তের জন্য এ ধারায় শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম প্রণয়ন করা হয়। পাঠক্রম কি রকম হবে তা কেতাবী ও সনাতন জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে হয় না। বরং মানব জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমকে শ্রেণীকরণ করে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করাই হল এ ধারার শিক্ষা-কারিকুলামের লক্ষ্য। মানবজীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কোনগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা যাচাই করেই পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে। এতে করে শিক্ষার্থী জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। জীবনের অপরিহার্য দিক সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিও সাধারণ শিক্ষা কারিকুলামে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা যে কারিকুলাম বা পাঠক্রম বিন্যস্ত রয়েছে তাতে উপর্যুক্ত শর্তের কোনোটিই প্রাধান্য পায় না। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার গোটা শিক্ষা-কারিকুলামে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ, সামাজিক প্রয়োজন ও সঙ্কটের কোনো শর্তই বিবেচনায় রাখা হয় না। শিক্ষাকে সময় উপযোগী তথা সমকালীন করার অর্থই হল যখন যে ধরনের সমস্যা বা সঙ্কট দেখা দিবে তার উপর ভিত্তি করে কারিকুলাম প্রণয়ন করা। জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষাসমূহের মধ্যে কেবল সামান্য কিছু নির্ধারক (denominator) পাওয়া যাবে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও

কার্যকারিমূলক পাঠক্রম প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে। আর এই নির্ধারক উপাদানটি মূলত সেক্যুলার জ্ঞান দ্বারাই বিন্যস্ত করা সম্ভব। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষায় কারিকুলাম প্রণয়নের সময় কি এই বিষয়টি ধর্তবে আনা হয় । সেই একই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে: তাহলে কি করে মাদ্রাসা ধারার ফাজিল এবং কামিলের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাধারার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়কে সমমান করার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে?

শিক্ষা-পাঠক্রম প্রণয়নের দিক থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক। শিক্ষাপাঠক্রমে কি ধরনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে? কিংবা কি ধরনের জ্ঞান শিক্ষা-পাঠক্রম উন্নয়নে সাহায্য করতে সক্ষম হবে? এ প্রশ্নসমূহও শিক্ষা-পাঠক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষায় সনাতন ধারার প্রতি অকাট্য মেলবন্ধন, স্থির ও অপরিবর্তনীয় বিষয়বস্তুর প্রতি অধিকতর আগ্রহ উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহকে মোটেই ধর্তব্যে রাখে না। আমরা জানি সময়ের বিবর্তনে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও মানব চাহিদাকে ভিন্ন আঙ্গিক দিতে সাহায্য করছে, ফলে শিক্ষার বিষয়বস্তু কিংবা পাঠক্রম আর এক জায়গায় স্থির নেই। বিজ্ঞানের উন্নয়ন শিক্ষার কাঠামোগত ধারায় যথেষ্ট পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। এই পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা পাঠক্রমেও সংযোজন-বিয়োজনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনায়ও এই সত্যতা প্রমাণিত হয়। কিছুকাল পূর্বেও যেখানে শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়নে '3R' (Reading, Writing and Arithmatic) মেথড ব্যবহার করা হয়েছে। এই মেথডে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে : পঠন (Reading), লিখন (Writing) এবং গণিত (Arithmatic)। অনেক শিক্ষাতাত্ত্বিক দাবি করেন শিক্ষা পাঠক্রমের এই ত্রি-মাত্রা (Triad dimensions) যখন মানুষের নৈতিক কল্যাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তখনই ৩জ এর সঙ্গে যুক্ত হল আরেকটি R (Reproduction),অর্থাৎ 3R রূপান্তরিত হল 4R-এ।[১৪] এভাবে সত্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের ফলে আমাদের পাঠক্রমে সংযোজিত হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়, কলাকৌশল। বিভিন্ন জ্ঞান শাখায় সমন্বিত বিষয়াদিও পাঠক্রমে স্থান পাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা এই গতিপ্রবাহের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে শিক্ষাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়াসে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা ধারা থেকে অর্জিত শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীগণ আধুনিক রুচি ও মানসিকতার শিক্ষা পাচ্ছে, যা অর্জনের মধ্য দিয়ে এ ধারা থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীগণ জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্য দিয়ে এ লক্ষ্যটি কি অর্জিত হচ্ছে? মাদ্রাসা শিক্ষা যে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমমান হতে পারেনি তা পাঠক্রমের তুলনামূলক আলোচনা থেকেই স্পষ্ট করা যায়। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ফাজিল পর্যায়ের সিলেবাসটি লক্ষ করা যেতে পারে:

[১৪] আরো দেখুন Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I : The Cognitive Domain, New York : David McKay Co Inc. 1956.

ফাজিল পাঠ্যসূচি

১. মাতৃভাষা (বাংলা / উর্দু),
২. ইংরেজি
৩. উলুমুল কোরআন ওয়াল হাদিস (তিন পত্র, প্রতি পত্রে ১০০ নম্বর করে মোট ৩০০)

সাধারণ বিভাগ

৪. উলমুল আরাবিয়া ওয়াশশরয়িাহ (তিন পত্র, প্রতি পত্রে ১০০ নম্বর করে মোট ৩০০)

মুজবিদ বিভাগ

৫. উলুমুল তাজবীদ ওয়াল ক্বিরাত (তিন পত্র, প্রতি পত্রে ১০০ নম্বর করে মোট ৩০০)
৬. নৈর্বাচনিক বিষয় (যে কোনো একটি, প্রতি বিষয়ে তিন পত্র, মোট নম্বর ৩০০)

বিষয়সমূহ: ১. উর্দু, ২. ফার্সি, ৩. আরবি, ৪. বাংলা, ৫. ইসলামী দর্শন, ৬. রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ৭. অর্থনীতি এবং ৮. ইংরেজি

সাধারণ শিক্ষা (স্নাতক বা ডিগ্রী)

মাদ্রাসার ফাজিল পাঠ্যসূচির সিংহভাগই মূলত ইসলামী শিক্ষাধারাকে প্রতিফলন করছে। তারপরও নৈর্বাচনিক হিসাবে যে বিষয়গুলো রাখা হয়েছে তা মূলত সাধারণ শিক্ষা ধারায় বি.এ (পাশ কোর্সের কিয়দংশকে প্রতিফলন করে)। বি.এ পাশ কোর্সে পাঠসূচি বিন্যাসটি লক্ষ করা যাক:

১. আবশ্যিক বিষয়: বাংলা এবং ইংরেজি (১০০ নম্বর করে মোট ২০০)
২. অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে : রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি

ছক ৭ : ফাজিল ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা পাঠক্রম

এখানে ফাজিল পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব দেওয়া হয় ফিকাহ, আরবী সাহিত্য, কোরআনের তফসীর, হাদিছের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদির উপরে। আর বাংলা সাহিত্যের অংশ হিসাবে কিছু কবিতা ও গল্প পাঠদান করা হয়। কিন্তু গোটা পাঠক্রমে এমন কোনো বিষয় রাখা হয়নি যাতে করে শিক্ষার্থীগণ জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধ অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে। কারণ এই মূল্যবোধ অর্জনের জন্য শিক্ষাপাঠক্রমে দর্শন, ইতিহাস, চারুকলা এবং সাহিত্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রাধান্য দেবার প্রয়োজন রয়েছে। জীবনের উন্নতিসাধন, কিংবা জীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়াদিকে প্রাধান্য দেবার অংশ হিসাবে কারিকুলামের মধ্যে মাতৃভাষা, সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবহারিক জ্ঞান, ইত্যাদিকে শিক্ষা-পাঠক্রম প্রণয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার গোটা কারিকুলামের দিকে যদি আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেই তাহলে দেখা যাবে সাধারণ শিক্ষা কারিকুলামে বিদ্যমান এসব শর্তের কোনোটাই সেখানে নেই। তাহলে কি করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমতুল্য করার প্রয়াস নেওয়া হয়? শিক্ষাতো খামখেয়ালিপনার বিষয় নয়, কিংবা রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার ক্ষেত্র নয়। কিন্তু মাদ্রাসা ধারার ফাজিল ও কামিলকে সাধারণ শিক্ষাধারার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এর সমমান করার মধ্য দিয়ে সাধারণ শিক্ষার গুরুত্বকে খর্ব করা হয়েছে।

৫.১ শিক্ষার লক্ষ্যগত বৈশিষ্ট্য ও মাদ্রাসা শিক্ষা

অধিকাংশ শিক্ষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন শিক্ষার সঙ্গে মানুষের বিমূর্ত চিন্তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। পরবর্তী কালে এই বিমূর্ত চিন্তাই দর্শন হিসাবে রূপ লাভ করে। কিংসলে প্রাইস[১৫] দেখান শিক্ষাকে সমকালীন করে তোলার জন্য বিমূর্ত চিন্তার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলামে কি এই দার্শনিকতার ছোঁয়া রয়েছে? এ ধারার শিক্ষার মূলকথাই হলো আপ্তবাক্য তথা নিরবচ্ছিন্ন ও প্রশ্নাতীত বিষয়কে স্বীকার করে নিয়ে জ্ঞান চর্চা করা। এ বিবেচনায় মাদ্রাসাশিক্ষা দর্শনহীন। বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তায় জগত ও জীবন সম্পর্কে যে বাস্তবসম্মত জ্ঞান রয়েছে তাও এখানে চর্চা করা হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বলা যায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমপর্যায় থেকে ভাবা যায় না।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক শিক্ষার আরো দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে : প্রথমত: শিক্ষা হল শিশুদের আত্ম-উপলব্ধি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশকে ত্বরান্বিত করা। দ্বিতীয়ত : শিশুদের মধ্যে নাগরিক দক্ষতা এবং সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করাও শিক্ষার আরেকটি লক্ষ্য। শিক্ষার এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে আমরা মূলত প্রথা, কৃষ্টি, অনুশীলন, আইন এবং রীতিনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকি। আর এভাবেই আমরা শিক্ষার সাহায্যে সমাজের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোগত বিকাশকে ত্বরান্বিত করে থাকি। আবার অনেক শিক্ষাতাত্ত্বিক এটাও বিশ্বাস করেন যে: শিক্ষা সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন সমাজ-কাঠমো গঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থী সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হবে। বস্তুত একটি সমাজ অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, কিংবা অতীতের ভাল অর্জনগুলোকে ব্যবহার করে বর্তমানের নির্মাণকে পাকাপোক্ত করতে পারে। এর ভেতর দিয়েই সংগঠিত হয় ভবিষ্যতের সাংগঠনিক কাঠামো। একারণেই শিক্ষাকে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন (Reconstruction of experiences) বলা হয়। জন ডিউঈ, তিনিও একই অভিমত করে বলেন, 'শিক্ষা হলো অভিজ্ঞাতার একটি ধারাবাহিক পুনঃসংগঠন' (Process of living through a continuous reconstruction of experiences)।[১৬] শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্যের মধ্যে যেসব উপাদানসমূহ অনিবার্য বিদ্যমান থাকবে তা একনজরে দেখা যেতে পারে :

---

১৫ Price, Kingsley, 1967. "Philosophy of Education, History of " in Ed. by Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Vol 6, New York: Macmillan and Free Press, pp.230 - 243.

১৬ Dewey. John, (1916, rpt. 1979) Democracy and Education, New York. Eby, Frederick, The Development of Modern Education, ed., Prentice-Hall of India Pvt. Ltd, New Dellhi, 1964, p. 616. cf.

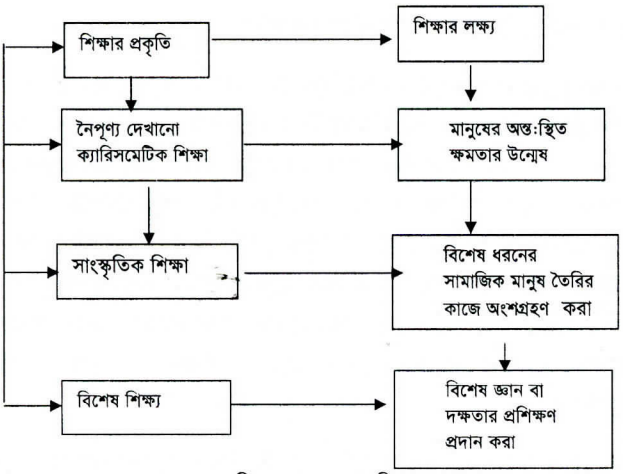

ডায়াগ্রাম ১ : শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতি

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় মানুষের জীবনের নানান সমস্য ও সঙ্কটের সঙ্গে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট। শিক্ষা ব্যতীত সামাজিক জীবনকে চিন্তা করা যায় না। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা পরিপূর্ণ অর্থে এই ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিরোধী। তাদের গোটা সিলেবাসে মাতৃভাষা, আমাদের অতীত ইতিহাস, সমাজ ও নৃতত্ত্বের প্রতি অবহেলা এটাই প্রমাণ করে যে মাদ্রাসা শিক্ষা কোনোভাবেই আধুনিক নয় এবং এতে জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির যথাযথ প্রতিফলন নেই। সুতরাং একে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমমান করার প্রশ্নটি মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

আধুনিক শিক্ষাধারা প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা যাক: আধুনিক শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সমাজের সদস্যগণ তাদের অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, মনোভাব, প্রবণতা ইত্যাদি সমাজের নবীন অপরিপক্ক সদস্যদের মধ্যে বিনিময় করে থাকেন। আর এভাবে শিক্ষার ধারাবাহিক পরিকল্পনাটি বেগবান হতে থাকে। সুতরাং এই বেগবান করার কাজটি কি মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব ? মোটেই না। জর্জ এফ নেলার Foundation of Education শীর্ষক গ্রন্থে দর্শনের তিনটি কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার তিনটি কাজের প্রস্তাব করেন, সেগুলো হল: অনুধ্যানমূলক (Speculative), নির্দেশনামূলক (Directional) এবং বিচারমূলক ও বিশ্লেষণমূলক (critical and analytic)।[১৭] মাদ্রাসা শিক্ষা ও তার প্রণীত কারিকুলাম পরিপূর্ণ অর্থে এই তিনটি কর্ম পরিপন্থি। এ শিক্ষার ধারার মধ্যে যেমন অনুধ্যান করার প্রয়াস নেই, তেমনি নতুন নতুন চিন্তাকে যাচাই বাছাই করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার প্রত্যাশাতো অনেক দূরের ব্যাপার। শিক্ষার অনুধ্যানমূলক কাজটি প্রসঙ্গে বলা যাক: অনুধ্যানমূলক কাজের মূল লক্ষ্য হলো জগত ও জীবনের গভীর অন্তর্গত

[১৭] Kneller, George F., 1963. Foundations of Education, , New York, John Wiley and Sons Inc., , p.86.

সমস্যাদি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা। এই প্রশ্ন উত্থাপনের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী চিন্তনমূলক গভীরতা অর্জন করে থাকে। অনুধ্যানই আমাদের জ্ঞান, চিন্তা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনে, পরিবর্তন আনে, সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হলো এই গতিকে থামিয়ে দেওয়া। তাহলে কি করে দুই বিপরীতধর্মী শিক্ষাকে একই মাপকাঠির নিরিখে বিচার করা হবে? সমমান প্রদান করা হবে? এ প্রশ্নসমূহ নীতিনির্ধারকদের ভেবে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে।

৬.০ দক্ষতা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা

দক্ষতা ও মানবউন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষা কি কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে? এ প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারব : মাদ্রাসা শিক্ষা বাস্তবিক অর্থে কোন ধরনের শিক্ষা? সাধারণত দাবি করা হয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার জন্যই শিক্ষা অন্যতম একটি উপাদান। বিগত দুইশ বছরের ব্যবধানে গোটা পৃথিবী যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে আমাদের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশাল জনগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও মোট জনগোষ্ঠীর ৪৫ ভাগকে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করতে হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষায়ই যেখানে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত সেখানে পশ্চাৎমুখী মাদ্রাসা শিক্ষা কিভাবে সংশ্লিষ্ট জনগাষ্ঠীকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে?

উন্নয়নবিদ্যায় আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে দায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর কারণ হলো এ জনগোষ্ঠীকে যুগোপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাপ্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার কোনো প্রয়াস আদৌ আমরা হাতে নিই নি। সমকালীন উন্নয়ন অর্থনীতির পাঠ থেকেও আমরা জানতে পারি : শুধু বস্তুগত সম্পদের সংরক্ষণ ও পুঞ্জিভবনই উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত নয়। বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের শর্ত হিসাবে দক্ষ জনশক্তিকে চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আর এই দক্ষ জনশক্তি তৈরির কাজটি শিক্ষার মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। সুতরাং শিক্ষা দুটি আপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে সক্ষম: এক. যে উদ্বৃত্ত জনগোষ্ঠীকে দায় হিসাবে মনে করা হচ্ছে তাদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে সম্পদে রূপান্তরিত করা , দুই. বিদ্যমান অধিক জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের অপরিমেয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে এই বোধটি জাগ্রত করা। এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্য নির্মূল করা সম্ভব হতে পারে। এই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনগোষ্ঠীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

আমাদের গোটা জাতির অর্থনৈতিক দৈন্যদশা মোচনের জন্য যেখানে প্রয়োজন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের শিক্ষা, প্রযুক্তিকে যথাযথ কাজে লাগানোর মতো দক্ষতা অর্জন এবং প্রযুক্তি

ব্যবস্থাপনার মতো কুশীলতা সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে অতি উৎসাহ পশ্চাৎপদ মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

৭.০ মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে বহির্বিশ্বের অভিজ্ঞতা

উপর্যুক্ত সমস্যা ও সংকট নিরসনের উপায় হিসাবে একে মূলধারার শিক্ষাস্রোতের সঙ্গে সমন্বয় করা প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টা সফল দৃষ্টান্ত হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের অভিজ্ঞতাকে আমরা বিবেচনা করতে পারি। ভারতীয় সংবিধানের মূলনীতি "সকল মানুষের সমান অধিকার" এই নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অংশ হিসাবে বিভিন্ন রাজ্য তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনাচরণ, ধর্মীয় উপলব্ধির ভিত্তিতে নিজ নিজ শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাসের প্রয়াস চালাচ্ছে। এই প্রয়াসের অংশ হিসাবে 'পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড' এর তত্ত্বাবধায়নে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা'র ভাবাদর্শে পরিচালিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে এর মূলস্রোতের সঙ্গে একীভূত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

এ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে 'পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড' মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার ১০ ম শ্রেণী পর্যন্ত কারিকুলামের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস নেয়। মাদ্রাসার জন্য অতিরিক্ত কোর্স হিসাবে ইসলামী চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কোর্স রেখে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিকের কোর্সসমূহ সমন্বয় করা হয়। এতে করে মাদ্রাসা থেকে আলীম উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ সাধারণ শিক্ষাস্রোতে প্রবেশ করতে পারবে। আবার যারা ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চায় তারা মাদ্রাসার উচ্চ পর্যায়ে বিশেষ করে ফাজিল, কামিল ও মুমতাজুল মুহাদ্দাসিন পর্যায়ে সেসব বিষয় নিয়ে পাঠ গ্রহণ করতে পারবে। মাদ্রাসা ধারার আলিম পর্যায় পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় করার ফলে মুসলিম শিক্ষার্থীগণ একদিকে যেমন ইসলামী জ্ঞান চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছে, অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষাধারা থেকেও তারা বঞ্চিত হলো না।

শিক্ষা-কারিকুলামকে এভাবে বিন্যস্ত করার ফলে মাদ্রাসা থেকে শুধু মুসলিম নয়, অন্যান্য জাতি ধর্ম বর্ণ ও গোত্রের শিক্ষার্থীরাও এখান থেবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এমনকী অন্য ধর্ম বর্ণের শিক্ষার্থীরা যদি মনে করে ইসলাম সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ গ্রহণ করবে তাহলে সেটাও এখান থেকে সম্ভব। আবার এ শিক্ষাধারাকে আরো বেশিমাত্রায় সেক্যুলার করার জন্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্ম বর্ণ অপেক্ষা যোগ্যতা ও দক্ষতাকে তারা গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কোনোপ্রকার ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে তারা মোল্লা-মৌলভী নির্ভর করে তোলেনি। বরং বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, উদারতা ও সম্প্রীতির প্রতীক হিসাবে মাদ্রাসা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকে তারা গুরুত্ব দিয়েছে। এখন শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৫০৮ টি মাদ্রাসায় মোট তিন লক্ষ ত্রিশ

হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে চল্লিশ হাজারেরও বেশি হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।[১৮] যা মোট শিক্ষার্থীর ১২ শতাংশ। মাদ্রাসায় সহশিক্ষাকেও তারা উৎসাহিত করছে, ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। এমনকি নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্যসমূহও কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি করছে না। আবার মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়েও আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইসলামী বিষয়াদির অধ্যয়ন ও অনুশীলনের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়াদিও শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব আলিয়া মাদ্রাসা কৃর্তপক্ষ সাদরে গ্রহণ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায়, অমুসলিম যারা সেখানে মাদ্রাসাশিক্ষা গ্রহণ করছেন তারা নিশ্চয়ই ধর্মগুরু হওয়ার জন্যে ঐসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) আসেননি; বরং তারা অন্যান্য সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন, বলা যেতে পারে, আরও অধিকতর যোগ্যতার সাথেই।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মত কেরালাও মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। কেরালার মোট জনগোষ্ঠীর এক চর্তুথাংশ মুসলিম। সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ধারার ইসলামিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। সামস্তা কেরালা জাম-ইয়াত উল উলামা (Samastha Kerala Jam'eyyat Ul-Ulama)'র অধীনে মুসলিম শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। কেরালার সামস্তা (Samastha) শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সর্বমোট আট হাজার মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে ১২ বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সাধারণ সেক্যুলার শিক্ষার কোনো প্রকার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। আবার ইসলামী ধারায় উচ্চশিক্ষার জন্য তাদের রয়েছে দারুল হুদা ইসলামিক একাডেমী (Dar ul-Huda Islamic Academy) এখানে ইসলামী বিষয়াদি পাঠদানের পাশপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সেক্যুলার জ্ঞানচর্চাকেও উৎসাহিত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর মোট তিন ধাপে ১২ বছরের শিক্ষা-কারিকলাম বিন্যস্ত করা রয়েছে। তন্মধ্যে দুই বছরের প্রিপেইটারি কোর্স, চার বছরের সেকেন্ডারি কোর্স, চার বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং দুই বছরের পি.জি কোর্স রয়েছে। এই বারো বছর যেসব বিষয়াদি পাঠদান করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো কোরাআন, তাসউদ, হাদীছ, উসুল উল হাদীছ, ফিকাহ্, উসুল উল-ফিকাহ্, আক্বীদা, তাসাউফ, ও তুলমানমূলক ধর্মতত্ত্ব। এসবের পাশাপাশি গণিত, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় পাঠদান করা হয়। ইসলাম ধর্মীয় বিষয়াদির সঙ্গে সেক্যুলার জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং এর সঙ্গে ভাষা-সাহিত্যকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষ করে আরবী, উর্দু, ইংরেজী এবং মালাইলাম ভাষায়ও তাদেরকে শেখানো হয়। পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি ছাড়াও অন্যান্য এক্সট্রা-কারিকুলা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানোর

[১৮] রায় ইসলাম ও অন্যান্য, ২০০৬, পৃ. ৯০.

প্রয়াস নেওয়া হয়। যেমন বিতর্ক, আলোচনা, বাক-প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার শিক্ষা, ক্রীড়া-বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

মাদ্রাসা ধারার সেকেন্ডারি পর্যায় পর্যন্ত কেরালা শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাস রয়েছে। শিক্ষার্থী যখন ১৮ বছরে পদার্পণ করে তখন সে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-প্রতিযোগিতার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা মূলত ভাষা-সাহিত্য, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ডিগ্রী অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। এজন্য দার উল-হুদা উপর্যুক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় বিষয়াদিও গুরুত্বের সঙ্গে পাঠদান দিয়ে থাকে। এসব বিষয়ে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষার্থীরা একাধারে সেক্যুলার এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করে থাকে।

ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াও মাদ্রাসাশিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়াস নিয়েছে। এই প্রয়াসের অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীগণ যেন আধুনিক রুচি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠতে পারে সে দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মালয়েশিয়া সরকার সাধারণ শিক্ষাধারার সমান্তরালে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার প্রকল্প হাতে নেয়। মাদ্রাসা শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষার্থীরা যেন সাম্প্রদায়িক না হয়ে উঠে, শুধু ধর্মীয় জ্ঞানেই যেন প্রাজ্ঞ না হয় সেদিক বিবেচনা করে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে মানবিক শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করানো প্রয়াস নিয়েছে। ইসলামী ধর্মীয় জ্ঞানে উচ্চশিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় বিষয়ের উপর স্নাতক সম্মান ডিগ্রী দেওয়া হচ্ছে।

সারা পৃথিবীর উন্নয়নের জোয়ারের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেবার জন্য যেখানে আমাদের দরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতা। প্রতিনিয়ত গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তিকে দেশজ চাহিদার সম্পূরক করে তোলা, সেখানে পশ্চাৎপদ ধর্মীয় শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করার মধ্য দিয়ে উন্নয়নের আভিধানিক ও বাস্তবভিত্তিক ধারা সঙ্কটাপন্ন হচ্ছে। যেখানে উন্নয়নবাদী কল্যাণ অর্থনীতিবিদগণ জোরেসোরে দাবি করছেন যে উন্নয়নে ভেতরে সজীবতা নেই, সক্রিয়তা নেই, আছে শুধু বাইরের অনুকম্পা, চাপ সেই উন্নয়ন কখনোই মানবীয়-উন্নয়ন হতে পারে না। সুতরাং আমরা সেই শিক্ষা চাই যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সামাজিক পছন্দ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তার মধ্য দিয়ে নাগরিক তার নিশ্চিত বেঁচে থাকার পথটি খুঁজে নেবে, মানবিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা সেটা যে পর্যায়েরই হোক না কেন তা কি উন্নয়নের এই শর্তসমূহ সরবরাহ করতে সক্ষম? মোটেই না, বরং উন্নয়নের এই শর্তসমূহ মাদ্রাসা শিক্ষা-কারিকুলামের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। আমরা শিক্ষার মধ্য দিয়ে নাগরিককে সক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তরিত করব, শিক্ষা প্রসারের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে

দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার প্রতিশ্রুতি নেব, আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে স্বত্বাধিকার বা এনটাইটেলমেন্টের[১৯] বিষয়টিকে নাগরিকের দোড়গোড়ায় পৌঁছুতে সক্ষম হব। তবেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাস্তবভিত্তিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করা যাবে। এর জন্য প্রয়োজন সেই আঙ্গিকের শিক্ষা যা একাধারে বিজ্ঞানমনস্কতা, গোটা পৃথিবীর উন্নয়নের ধারাবাহিকতা, পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে অনুসৃত হয়। মাদ্রাসায় যে শিক্ষা-কারিকুলাম রয়েছে তা-কি আমাদের উন্নয়নের সেই বাস্তবতায় নিয়ে যেতে আদৌ সহায়ক? নিঃসন্দেহে সহায়ক নয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে হাজার বছরের অচলায়তনের যূপকাষ্ঠ থেকে উত্তরণের এই প্রয়াসের অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যেতে পারি নতুন পথে। এই কাজটি অন্ততঃ রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ অবয়বে রাখার জন্য টিকিয়ে রাখার জন্য হতে পারে সর্বশেষ হাতিয়ার।

৮.০ উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা শিক্ষার ধরন, প্রকৃতি এবং মানব-উন্নয়নের পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মাদ্রাসা শিক্ষার বাস্তবভিত্তিক কিংবা যুগোপযোগিতা নেই। এই শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা অপেক্ষা পশ্চাৎমুখীন করে থাকে। শুধু মাদ্রাসা নয় আমাদের সাধারণ শিক্ষায়ও যে সঙ্কট রয়েছে তাও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এই সংস্কারের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চিন্তা করা। শিক্ষার ভেতর দিয়েই আমরা এই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ ও গণমুখী পরিকল্পনা। স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন পরিকল্পনা বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ করেছি শিক্ষাখাতকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা পরিকল্পনাকে আরও উন্নত করার পাশাপাশি মাদ্রাসাশিক্ষার সংস্কার জরুরি।

৮.১ মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার ও কয়েকটি প্রস্তাবনা

ধর্ম ও শিক্ষা দুটি ভিন্ন বাস্তবতা। ধর্ম যে লক্ষ্য অর্জনে তৎপর শিক্ষা তা থেকে ভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহী। আমরা লক্ষ করে দেখব আমাদের বিভিন্ন শিক্ষীনীতিতে (কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ব্যতীত) ধর্মীয় শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে নীতিশিক্ষাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর প্রত্যেকটি শিক্ষা রিপোর্টে 'ধর্ম ও নীতিশিক্ষা' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ রাখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়: "শিক্ষার্থীর নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য (কিংবা নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য) ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে"।

---

[১৯] Sen, Amartya, 1981. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford : Oxford university Press.

এরকমভাবে প্রত্যেকটি শিক্ষা কমিটি রিপোর্টে নৈতিকতাকে ব্যাখা করা হয়েছে ধর্মীয় মূল্যবোধের আঙ্গিকে, কিংবা পরিপূরক অর্থে । কিন্তু বাস্তবিক অর্থে নীতিশিক্ষা আর ধর্মীয়শিক্ষা কি সদৃশ, কিংবা পরিপূরক? মাদ্রাসা শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো কিংবা সংস্কারের পূর্বে এ প্রশ্নের একটি যুক্তিযুক্ত মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন ।[২০]

শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন, দারিদ্র্য-বিমোচন, এবং সারা পৃথিবীর অগ্রযাত্রায় আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এ দিকগুলো বিবেচনায় রাখা খুবই প্রয়োজন । এজন্য আমাদের শিক্ষানীতিতে কতগুলো পন্থা থাকা বাঞ্ছনীয়: ১. বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, ২. কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, ৩. প্রায়োগিক বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করতে হবে, ৩. আমাদের কৃষি সম্ভাবনা রয়েছে, কর্মক্ষম বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে । এ কয়েকটি দিক বিবেচনা করে কৃষি ও শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে বিশাল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে । সম্প্রতি পশুপালন এবং মৎস্য চাষে আমাদের কিঞ্চিত সফলতা এসেছে । এই সফলতাকে মডেল ধরে এখানেও ব্যাপক বিস্তৃত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া উচিত । আর এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য মাধ্যমিক পাশের পর, শিক্ষার্থীদের মৎস্য চাষ, গবাদী পশুপালন এবং পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান-কৌশল বিষয়ে দুবছরের ডিপ্লোমা মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে । আমাদের জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে আরো স্বচ্ছতা, রাজনীতিবিদদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং জাতীয় সম্পদ হিসাবে মানবশক্তি, প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে । এজন্য আমাদের শিক্ষানীতিতে আরো কয়েকটি শর্তের অনুশীলন প্রয়োজন:

ক. প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের মধ্যে সংগতি আনতে হবে ।

খ. জাতীয় উন্নয়নের শর্ত হিসাবে আমরা যদি শিক্ষাকে কাজে লাগাতে চাই তাহলে বিদ্যালয়সমূহে প্রত্যেক নাগরিকের প্রবেশাধিকার রাখতে হবে । ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-সংস্কৃতি-অর্থ নিরপেক্ষভাবে সকল শ্রেণীর শিশুর জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা উন্মুক্ত রাখতে হবে ।

গ. জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়াদিকে পাঠক্রমে স্থান দিতে হবে ।

ঘ. সংবিধানে যে নাগরিক অধিকার এবং ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে তার বাস্তবায়নও সুস্থ ধারার শিক্ষা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যে শিক্ষাচিন্তা নিয়ে রাষ্ট্রের নাগরিক সম্প্রদায় গড়ে উঠবে

---

[২০] দেখুন, ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, "শিক্ষা ধর্ম ও নৈতিকতার আন্তসম্পর্ক প্রসঙ্গ : দার্শকি বিতর্কেও কয়েকটি দিক", সমাজ নিরীক্ষণ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১০৮ : জানুয়ারী-মার্চ ২০০৯ ।

তাতে অবশ্যই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থাকতে হবে। শিক্ষার মধ্যে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত হতে হবে মানুষ ও মানুষের সমাজিক প্রয়োজনসমূহ। যদি সমাজ, মানুষ এবং মানুষের প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে কোনো শিক্ষানীতির প্রস্তাব হয় তা হয়ে উঠবে অবাস্তব ও অতিকাল্পনিক। অর্থনৈতিক প্রয়াসের পাশাপাশি শিক্ষার্থীকে কিভাবে আদর্শ বৈশিষ্ট্যের (ideal character) অধিকারী করে তোলা যায় তা নিয়েও ভাবতে হবে। শিক্ষার্থীর মানসিকশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে ভুমিকা রাখতে হবে। এই ভাবনায় থাকতে হবে শিক্ষামনস্তত্ত্বের স্পষ্ট প্রভাব। কিন্ত বাংলাদেশের শিক্ষাকাঠামোয় মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গের প্রভাব লক্ষ করা যায় না। যে কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থী ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে তার প্রাণচাঞ্চল্য, উদ্যম ও সংবেদনশীলতা।[২১] সংবেদনশীলতা-বর্জিত শিক্ষা 'সামাজিক প্রক্রিয়ার' সঙ্গে 'ব্যক্তিক প্রক্রিয়ার' যুগপৎ সম্মিলন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে উঠছে নিস্প্রভ। এই নিস্প্রভ শিক্ষা (passive education) না পারছে ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করতে, না পারছে তাকে সামাজিক প্রগতির অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত করতে।[২২]

---

২১ Russell, Bertrand, 1926. On Eudcation, chapter: aims of Education, London: Unwin Paperback.

২২ গবেষণা কর্মটি মাসিক শিক্ষাবার্তার সৌজন্য সম্পন্ন। শিক্ষাবার্তার ২০০৫, ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় এর আংশিক ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

Bhuiyan, M Musharraf Hossain, Secretary, Ministry of Primary and Mass Education Operational Framework for Pre-Primary Education.

Bloom B.S.1956.Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I : The Cognitive Domain, New York : David McKay Co Inc.

Dewey. John, (1916, rpt. 1979) Democracy and Education, New York.

Eby, Frederick, 1964.The Development of Modern Education, ed., Prentice-Hall of India Pvt. Ltd, New Delhi.

Evans, J. L. *et al.* 2000.Early Childhood Counts: A programming Guide on Early Childhood Care for Development, Washington D.C. The World Bank.

Kingsley Price, "Philosophy of Education, History of " in Ed. by Edwards, The Encyclopedia of Philosophy ,Vol 6.

Kneller, George F., 1963. Foundations of Education, New York, John Wiley and Sons Inc.

Russell, Bertrand, 1926. On Education, chapter: aims of Education, London:Unwin Paperback.

Sen, Amartya, 1999, Development as Freedom, Knopf, New York.

Sen, Amartya, 1981. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford : Oxford university Press.

Stone, Jon R. (ed.), The Essential Max Müller: On Language, Mythology, and Religion, New York: Palgrave, 2002.

Report 1949, Report of the East Bengal Educational System Reconstruction Committee, East Bengal Government.

http://www.mopme.gov.bd/MoPME%20PPE%20operational%20framework.pdf, at 9 a.m on 29 April 2009.

রায়, অজয়, ইসলাম, শহিদুল, তারেক আলী, জিয়াউদ্দিন ও অন্যান্য, ২০০৬, আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই : একটি বিকল্প ভাবনা, ইনস্টিটিউট ফর এনভায়েরনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।

শিক্ষানীতি, কুদরাত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, সম্পাদনাসহ প্রকীশত, বাকবিশিস।

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ, "সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার সমমানতা প্রসঙ্গ", শিক্ষাবার্তা, (শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা), সংখ্যা মার্চ ২০০৭।

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ, "শিক্ষা ধর্ম ও নৈতিকতার আন্তসম্পর্ক প্রসঙ্গ: দার্শকি বিতর্কের কয়েকটি দিক", সমাজ নিরীক্ষণ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১০৮: জানুয়ারী-মার্চ ২০০৯।